



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- III, Issue-I, September, 2026, Page No. 58-68

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.3.issue.01W.505



নবনির্মাণের আলোকে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের মহাভারতান্বিত গল্প ‘যাজ্ঞসেনী’ এবং ‘জরা ও বাসুদেব’: একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ

সুব্রত রায়, গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত

ড. জাহ্নবী দাস, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, লামডিং মহাবিদ্যালয়, অসম, ভারত

Received: 03.09.2026; Accepted: 14.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Bengali literature with its vastness has enriched the literary minds of all times. Writers of various eras were mesmerized by the epis Ramayana, Mahabharata, Puranas and myths. Even today characters, events from those influence the writers. They accept mythological events, characters or subject matter and attempt to give them a new form through various literary genres. This is recognized and considered as an innovative and curiosity-arousing literary thought. Whatever terminology it may be used in literature—deconstruction, recreation, reconstruction, re-reconstruction, etc. — the main proposition is that within such a collection of creative works lies the technique of giving the old a newly formed shape through new ways and new experimentation. The writer Gajendrakumar Mitra is also such an artist who has broken the Mahabharata from a modern scientific perspective, of which some of his novels and short stories are the excellent examples. Although he has written several myth- and Purana-centered short stories, if a few gem-like stories are selected from among them, it will be seen that their subject matter (Theme), character (Character), background (Background), etc. are from the Mahabharata, but the plot of the story is the writer's own. In thought and feeling, they are extremely modern and this deconstruction has occurred for the needs of the narrative itself. As examples, the names of a few stories are given -- 'Yajnaseni', 'Jara o Vasudev', 'Chhati Praner Mulya', 'Agnir Agnimandya', 'Gurur Prapya', 'Bhim-er Shiksha', 'Gangaputra', 'Homagni Sambhaba', etc. Among these, taking only two as the basis, the main subject of the complete discussion paper will be to bring out, in the light of Gajendrakumar Mitra's new interpretation, the literary skill of collecting epic sources and consciously applying them.

Keywords: Mahabharata, Reconstruction, Deconstruction, Materials, Elements, New Interpretation, Conscious, Modern, New Creation, Innovative

মননসমৃদ্ধ ও সৃষ্টিশীল মানুষ প্রতিনিয়ত সৃষ্টির নেশায় মেতে থাকে। হতে পারে তা স্বাধীন কল্পনাপ্রসূত মৌলিক অথবা পূর্বে রচিত কোনো কাহিনির প্রভাবজাত বা অনুপ্রেরণামূলক অনুসৃষ্টি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে অনুকরণ কী তবে মিথ্যা? তা কখনও নয়। কারণ-প্রখ্যাত সাহিত্যতাত্ত্বিক এরিস্টোটলের মতে, “অনুকরণ মানুষের

স্বভাবগত।”^১ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুপ্রাচীন কাল থেকেই তাই চলে এসেছে উপাদান ও উপকরণ হিসাবে ঋণ গ্রহণের পালা। তবে অবিকৃত অনুকরণ এক ধরনের ফটোগ্রাফি, তেমন ধরনের আহরণজাত ফসল শিল্পের মর্যাদা পেতে পারে না। কিন্তু এই সংগ্রহের প্রক্রিয়া যখন আন্তরিক- মনস্তাত্ত্বিক কিংবা নান্দনিক রসসৃষ্টির মাধ্যমে নবসৃষ্টির মর্যাদা লাভ করে, তখনই তা সুসার্থক হয়ে ওঠে। এই সম্ভাবনা থেকে উৎসারিত হয়েছে পুনঃনির্মিত সাহিত্যসম্ভার। তা হলে দাঁড়ায়, বিষয়বস্তুর উৎসভেদে সৃষ্টিশীল সাহিত্যকে মৌলিক ও অনুসৃষ্টি-এই দুই ভাগে সনাক্ত করা যায়। স্রষ্টার স্ব-উদ্ভাবিত আখ্যানকে মৌলিক সৃষ্টি বলে গণ্য করা হয় এবং অন্য কোনো কাহিনি বা গল্পের প্রভাব বা প্রেরণাজাত রচনাকে অনুসৃষ্টি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সাহিত্যজগতে এমন অনেক সৃষ্টিকর্মের উল্লেখ করা যায় যেগুলির উৎসস্থল অন্য কোনো সাহিত্য হলেও নবসৃষ্ট সাহিত্যগুলিও স্বীয় অভিনবত্বে চিরস্মরণীয়। কালিদাসের 'অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্' যার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয় সংগৃহীত হয়েছে মহাভারতের আখ্যানভাগ থেকে। আবার বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' গদ্য গ্রন্থটিও রচনাগুণে মৌলিক সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছে, অথচ এর উৎসভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে বাঙ্গালী 'রামায়ণ', ও ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' গ্রন্থদ্বয়। অতএব, একথা স্বীকার্য যে, অনুসৃজন মাত্রেই অক্ষমতার পরিচায়ক নয়। বরং বলা বাহুল্য, অনুকরণমূলক সৃষ্টিতে নির্মাণশৈলীর দক্ষতা এমনই প্রখর যে তাকে পুনঃসৃষ্টি বলে চেনাটা সহজসাধ্য নয়। তাইতো সংগত কারণেই তা লাভ করে মৌলিকত্বের শিরোপা এবং আমরা এমন সৃষ্টিকর্ম থেকে পেতে পারি মৌলিকত্বের আশ্বাদ।

বাংলা সাহিত্যে সুদূর মধ্যযুগ থেকেই পুনঃনির্মাণের একটি ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একে প্রভাব বললেও অনুকরণের স্থানটিকে অস্বীকার করা যায় না। তাই তো যে "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" (বড়ুচণ্ডীদাস) কাব্যে রয়েছে ভাগবত, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও গীতগোবিন্দের ছায়াপাত, সেই কাব্যটিকে নিয়েও আবার আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা পুনঃসৃষ্টির আয়োজনে লিপ্ত হন। তা ছাড়া পঞ্চদশ শতক থেকে অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যদিয়ে বাংলা ভাষায় অনুসৃষ্টির ধারাটি দৃঢ়তা লাভ করে।

অনেকাংশে মূলানুগত হয়েও বাংলা রামায়ণ-মহাভারতের অনূদিত রূপ বাঙ্গালী কিংবা ব্যাসদেবের হুবহু ও আক্ষরিক তর্জমা মোটেই নয়। বরং বলা যায়, বাংলার অনুবাদক কবিরা (যেমন- কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, চন্দ্রাবতী প্রমুখ) মূলানুসরণ করলেও তা থেকে আখ্যানভাগ গ্রহণ করে তন্মধ্যে তাঁরা নিজস্বতা আরোপ করেছেন। এরমধ্যে অন্যতম হল বাঙালিয়ানার প্রক্ষেপ। এটাও কিন্তু এক অর্থে পুনঃনির্মাণই বটে। অতএব, অনুসৃজনের প্রসঙ্গ কেবলমাত্র আধুনিক কালেই নয়, প্রাগাধুনিক সাহিত্যেও এর বিকাশ ও বিস্তারের প্রাদুর্ভাব ঘটেনি।

তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, সাহিত্যজগতে মৌলিক সৃষ্টির গুরুত্ব, মর্যাদা ও মূল্য যেখানে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং সমাদরণীয়- সেখানে অনুসৃষ্টি বা পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এর উত্তরে বলা যায়, মূল সৃষ্টির মধ্যে যদি অসংখ্য তাৎপর্যপূর্ণ সম্ভাবনা কিংবা নব নব চিন্তার অবকাশ থেকে যায়- যা মূলগত সৃষ্টির মধ্যে বীজাকারে নিহিত থাকে, তখন সেই নেপথ্যচারী প্রবল ব্যঞ্জনাবাহী অব্যক্ত সম্ভাবনাকে নবকলেবরে নতুন কোনো শিল্পের আঙ্গিকে নবনির্মাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দান করেন উত্তর কালের স্রষ্টাগণ। ফলে তাঁরা ভাবীকালের পাঠকবর্গকে সচেতন করতে সাহায্য করেন এবং নতুনভাবে ভাবতে শেখান। কাহিনি, চরিত্র, ভাবাদর্শ, আঙ্গিক কিংবা সাহিত্যের যেকোনো উপকরণ হতে পারে এজাতীয় নবসৃষ্টির মূল আধার, উপজীব্য বিষয় ও অন্যতম সাহিত্যিক উপাদান। এককথায়, নতুন জীবনবোধ দিয়ে পুরাতনকে দেখা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে 'চেনার মাঝে অচেনাকে' যাচাই করে নেওয়াই পুনঃনির্মাণ জাতীয় রচনার মূল অভিপ্রায়। আবার সেখানেও দেখাদেয় রচনাগত ও ভাবগত বৈচিত্র্য। কারণ, সব লেখকের জীবনবোধ এক ও অভিন্ন হয় না- বরং মানুষ মাত্রেরই স্বতন্ত্র

মানসিকতার অধিকারী হওয়ায় একই কাহিনি একাধিক ব্যক্তির হাতে পৃথক পৃথক ব্যঙ্গনার ধারক হয়ে ওঠে। যেমন- মহাভারতীয় কর্ণ ও কুন্তীর প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', বুদ্ধদেব বসুর 'প্রথম পার্থ' ও সমরেশ বসুর 'পৃথা'-র কাহিনি এক হলেও তাদের রসাবেদন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণ ঘটেছিল তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অতীতচারণার মাধ্যমে নিজেকে ফিরে দেখা এবং তার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার পথনির্মাণ করা। ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সন্ধান ও তারই মধ্যে পুনরাবিষ্কারের প্রতিষ্ঠা দানই ছিল নবজাগ্রত বাঙালি মননের সঞ্জীবনী শক্তি আহরণের একটি পথ। কিন্তু শুধুমাত্র পুরোনো অতীতকে আঁকড়ে থাকলেই চলবে না— তার মধ্যদিয়ে নতুনত্বের আশ্বাদ আনতে হবে, হাঁটতে হবে আগামী দিনের নবালোকিত পথে। এই নবত্ব সাধনই আসলে পুনঃনির্মাণের মূল কথা। এই ভাবনাগত ফসল সাহিত্যে প্রবাহিত হলেও শিল্পকলা ও সাহিত্যের জগতে এটি একটি তাত্ত্বিক বিষয়ও বটে।

নির্মাণ-বিনির্মাণ- পুনঃনির্মাণ তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক ও সমালোচক রণে ডেকার্ত, ইমানুয়েল কান্ট, কাল মার্কস, হিপোলাইত তেইন, ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর, মার্টিন হাইডেগার এবং মিখাইল বাখতিন প্রমুখের প্রতিষ্ঠিত ধ্যান ধারণার ওপর ভিত্তি করে। তা ছাড়া বিনির্মাণ তত্ত্বের আলোকে বিশ-শতকের শিল্পজগৎ ও চিন্তার বলয়কে আলোড়িত করেন মনীষী জাঁক লকাঁ, রলা বার্ত, মিশেল ফুকো ও তাঁর শিষ্য জাঁক দেরিদা প্রমুখ তাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদ। তাঁরা বিভিন্ন সময় তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করলেও একটি ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। সেটি হল, যুগের বিবর্তনে সমাজ মানসিকতার যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনই পাল্টে যায় জীবনদর্শনও। বিবর্তিত সমাজ ও জীবনবোধের নিরিখে রচয়িতারা তাঁদের লেখনীতে দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটান। ফলে পূর্ববর্তী অনেক সাহিত্যই পরবর্তীকালে নতুনভাবে দেখা দেয়। এমনকি শুধু অন্যদের সাহিত্যেই নয়- একই লেখকের সাহিত্যকর্ম স্বীয় ভাবনার বিচারে সময়ান্তরে ভিন্ন ধারণার আবেশ তৈরি করে। তাইতো বর্তমান কালে দেখা যায় লেখকেরা প্রবলভাবে আমাদের চিরপরিচিত পুরাণ কাহিনিকে, রামায়ণ-মহাভারতকে, প্রাচীন সাহিত্যকে পরিবর্তিত সমাজ ও জীবন জীবনবীক্ষার আধারে নব নব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টায় নিরত থাকেন এবং নবসৃষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে তার যথাযথ রূপদানে সচেষ্ট হন। কখনও নতুন কালের ও নতুনভাবে আরোপে পুরাণ কাহিনির নবরূপায়ণ ঘটান, কখনও নবপুরাণ রচনা করেন, কখনও বা পুরাণ কল্পকাহিনি নির্মাণ করেন, আবার কখনও নিজস্ব কল্পনার মধ্যে পুরাণকে অনুপ্রবিষ্ট করে কাহিনি ও বিষয়কে নতুন মাত্রা দান করেন। তদ্রূপ পুরোনো সাহিত্যের মধ্যেও বহন করে আনেন নব ভাবনার সঞ্জীবনী সুধা এবং নবাস্পিকে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে পুরোনো সাহিত্য কৃতিকে ভেঙে গড়ে তোলা হয় আধুনিক পাঠকের উপযোগী নতুন চিন্তাসম্বলিত পাঠকৃতি। তবে এহেন নবনির্মিতি পাঠে শুধুমাত্র নান্দনিক ভাবনাই ক্রিয়াশীল থাকে না, বরং তাতে যুক্ত হয় সময়-সমাজ- রাজনীতি- ইতিহাস এবং মানস পরিক্রমার নবতর আশ্বাদ এবং সেই সঙ্গে মিশ্রিত থাকে সমকালীন মানুষের জীবন জিজ্ঞাসাও। এভাবেই নতুন প্রজন্মের পাঠকসমাজ একালের লেখকের সৃষ্টির মধ্যে বহুস্বরিতার সন্ধান পান।^১ জাঁক দেরিদার মতে, এই বিনির্মাণ হল একটি ধারাবাহিক পাঠ প্রক্রিয়া। রচনাকারের রচনাটি সমাপ্ত করার পর সেটি আর তাঁর নিজস্ব হয়ে থাকে না- তা হয়ে ওঠে সর্বজনীন পাঠকের উপভোগ্য ও আশ্বাদনের সামগ্রী। ভিন্ন ভিন্ন পাঠক তো বটেই, এমনকি একই পাঠক বিভিন্ন সময় দাঁড়িয়ে একই রচনার মধ্যে নানান অর্থ খুঁজে পান। এর ফলে পূর্বানুভূতির স্থান দখল করে নেয় নতুন প্রতীতি বা নতুন সাহিত্যানুশঙ্গ। পুরাতন কাঠামো না ভাঙলে নবসৌধ নির্মাণ করা যায় না। এই ভাঙা গড়ার সম্পর্কটিকে দেরিদা বলেছেন, Construction, De-construction এবং Re-Construction। বাঙালি তাত্ত্বিকেরা যার নাম দিয়েছেন নির্মাণ, বিনির্মাণ, পুনঃনির্মাণ। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ও সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, “পাঠকৃতিতে যা কিছু অনতিক্রম্য ও আপাতগৌণ, তাদের প্রান্তিক অবস্থান থেকে ওরা চলে আসে মনোযোগের কেন্দ্রে।”^২ এক

কেন্দ্রকে ভাঙতে গিয়ে গড়ে ওঠে পুনঃ পুন অজস্র কেন্দ্র। ভারতীয় পুরাণে, মিথ্যে, রামায়ণ-মহাভারতে, প্রাচীন গাথা কাহিনিতে এবং পুরোনো বহু সাহিত্য-কৃতিতে এমন বহু প্রসঙ্গ নেপথ্যেই থেকে গেছে যা আধুনিক স্রষ্টাদের হস্তস্পর্শে ভিন্নতর ও নবব্যঞ্জনা লাভ করার অবকাশ রাখে। পূর্বেকার তৈরি কাঠামোকে ভেঙে, কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যখন নতুন দৃষ্টিকোণে মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যাযোগ্য নব-বয়ান উপস্থাপিত করা হয়, তখন সেখানে বহুস্বরের কখনবিশ্ব উদ্ভাবনের মাধ্যমে মূল পাঠের বা পূর্ব সৃষ্টির বিনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ ঘটে।

ভারতবর্ষের দুই জাতীয় মহাকাব্য (Classical Epie) -এর মধ্যে একটি হল মহাকবি বাণ্মীকি রচিত রামায়ণ, অপরটি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত। এই দুটি যে শুধুমাত্র মহাকাব্য তা নয়। বরং এই দুটি গ্রন্থে সমাহিত হয়ে আছে নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, রাজতন্ত্র, ইতিহাস, সমাজ, মনস্তত্ত্ব, গৃহসূত্র এমনকি দর্শন ভাবনাও। তা ছাড়া এই গ্রন্থ দুটির ধর্মানুগত বিশ্বাসের শেকর এমন সুদূরপ্রসারিত এবং এতে এমন এক অলৌকিকতার বিস্তার রয়েছে যার জন্য গ্রন্থ দুটিকে মিথ-পুরাণের অন্তর্ভুক্তও করা হয়ে থাকে। ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার নিরিখে জনজীবনে এই গ্রন্থ দুটির ভূমিকা অপরিসীম। বলাবাহুল্য, ভারতীয় সাহিত্যের মূল প্রেরণা এই দুই মহাকাব্য। গ্রন্থদ্বয়ের বিচিত্র আখ্যান ও বিভিন্ন চরিত্র ভারতবর্ষের সাহিত্যকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা দান করে এসেছে। বাংলা সাহিত্যেও তার বতায় ঘটেনি। এপ্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বলেছেন,

“রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এই ইতিহাসের পরিবর্তন নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকাল সিংহাসনে বিরাজমান।”^৪

তাইতো আধুনিক কালেও বাংলা গল্প উপন্যাসে এই গ্রন্থের সার্থক ব্যবহার লক্ষ করা যায়— যেখানে গ্রন্থগুলো থেকে উপাদান নিয়ে তাদের আধুনিক জীবনের পটভূমিকায় স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলেই পুরাণের নবজন্ম ঘটেছে এবং পুরাণ হয়ে উঠেছে নবব্যঞ্জনার শিল্পীত রূপ। সমালোচকের ভাষায়,

“..... নতুন ব্যাখ্যা সম্বলিত হয়ে প্রাচীন মিথ কাহিনির যে নবরূপায়ণ হয় তার অন্তর্নিহিত অর্থ বহির্বিশ্বাসের বক্তব্য—দুই-ই মূল মিথের ভাষ্যকে অতিক্রম করে যায়— কখনো সমসাময়িক প্রেক্ষিতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, কখনো বা ব্যক্তিগত বোধির সঙ্গে মানানসই করে গড়ে ওঠে এই নতুন পুনর্নির্মিত চেহারাটি।”^৫

বাংলা সাহিত্যে-মিথ পুরাণ -এর ব্যবহার সচেতনভাবে পাওয়া যায় উনিশ শতক থেকেই আর বিশ শতকে ঘটেছে তার বিকাশ ও বিস্তার- যার অন্যতম রূপকার ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রবীণ স্রষ্টা ও বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক গজেন্দ্র কুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪)। তিনি মূলত মহাভারতের কাহিনি ও চরিত্র অবলম্বনেই তাঁর কথাসাহিত্যে পুরাণ ভাবনার নবরূপ দান করেন। তাঁর সৃষ্ট এজাতীয় সাহিত্যকীর্তি কেবল পুরাণের নব ব্যাখ্যা মাত্রই নয় বরং নব উন্মোচনও বটে। বিশেষত ছোটগল্পের ক্ষেত্রে মিথ পুরাণের নিদর্শন স্বরূপ মহাভারতের নবনির্মাণ ও আধুনিক প্রয়োগ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের শিল্পীসত্তাকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। এপ্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

“গজেন্দ্রকুমার মিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব হল পুরাণ ও মহাকাব্যনির্ভর গল্পগুলিতে আধুনিক জীবন ও বাস্তবতা ও সংকটময়তার ছবিতে মিথের পুনর্নির্মাণ। পুরাণ মহাকাব্যের কাহিনী নিয়ে বর্ণাঢ্য দূর-অতীতের রুদ্ধশ্বাস জীবন বর্ণনা করে পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট করেছিলেন তিনি। পুরাণ আসলে তাঁর হাতে ছিল পাঠককে মুগ্ধ করার অসাধারণ জাদুশক্তি।”^৬

— পাঠককে মুগ্ধ করা তাঁর উদ্দেশ্য থাকলেও সেই অভিভূত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাঠককে নতুন ভাবনা চিন্তার জগতেও নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর নবনির্মিত মিথ পুরাণের আধারে লেখা গল্পগুলির মধ্যদিয়ে। তিনি মিথ পুরাণ কেন্দ্রিক বিশেষত মহাভারতশ্রিত বেশ কিছু ছোটগল্প রচনা করলেও তন্মধ্যে রত্নসম কয়েকটি গল্পকে নির্বাচন করে নিয়ে আমরা দেখাতে পারি, সেগুলোর বিষয়বস্তু (Theme) মহাভারতের হলেও ভাবে এবং অনুভবে গল্পগুলি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত আধুনিক। কাহিনির প্রয়োজনেই ঘটেছে এই বিনির্মাণ। গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- যাজ্ঞসেনী, জরা ও বাসুদেব, ছটি প্রাণের মূল্য, অগ্নির অগ্নিমান্দ্য, গুরুর প্রাপ্য, ভীমের শিক্ষা, গঙ্গাপুত্র, হোমাগ্নি সম্ভবা ইত্যাদি।

মহাভারতের বিশাল পটভূমিতে প্রত্ন পুরাণের বিষয়কেন্দ্রিক গজেন্দ্রকুমারের একটি প্রসিদ্ধ গল্প হল- 'যাজ্ঞসেনী'। এই গল্পে মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রের নবরূপায়ণই লেখকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নায়িকারা আপন ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির স্বাতন্ত্র্যে যেমন উজ্জ্বল, তেমনই এখানেও গজেন্দ্রকুমার দ্রৌপদীর একান্ত গোপন প্রেমাভেগের আত্মবিশ্লেষণ করে মহাভারতীয় কাহিনির রসাতাস ঘটিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অনুযায়ী পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও পাঞ্চলী তৃপ্ত নন। কারণ স্বয়ংবর সভায় কর্ণের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁকে না পাওয়ার জন্য তার যে আক্ষেপ, তার সেই আপন অন্তরের অব্যক্ত অনুভূতির দ্বিধাহীন প্রকাশেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আলোচ্য গল্পটি। স্বর্গারোহণের সময় কর্ণকে না পাওয়ার যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হয়েছে দ্রৌপদী। তাই অনিবার্যভাবেই মহাপ্রস্থানের পথে শুরুতেই পতন ঘটেছে তার। যুধিষ্ঠির তাকে দোষারোপ করেছেন এই বলে যে, পঞ্চস্বামীর প্রতি সমদর্শিতার ভাব তার ছিল না— অর্জুনেই তার প্রবল আসক্তি। এমনই এক গুরুগম্ভীর পরিবেশে যাজ্ঞসেনীর স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যদিয়েই আলোচ্য গল্প-কাহিনির অবতারণা। মহাভারতের কাহিনিতে থাকা সূক্ষ্মতম ফাঁকটুকু ভরাট করার আয়োজনেই গজেন্দ্রকুমারের গল্পে ঘটে গেছে এক অভূতপূর্ব বিনির্মাণ। গল্পে দ্রৌপদীর মানসিক অবস্থানটিকে লেখক সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, দ্রৌপদীর প্রার্থিত স্বামী যুধিষ্ঠির নন। যুধিষ্ঠিরের অনেক কাজই দ্রৌপদী মেনে নিতে পারেনি। পাণ্ডবদের রক্ষা করার জন্য জতুগৃহে নিষাদী ও তার পাঁচ পুত্রকে আগুন লাগিয়ে পলায়ন, দ্যুত ক্রীড়ায় তাকে পণ্য হিসাবে বাজি রাখা; দ্রৌপদীর সঙ্গ ব্যতীত চার বছর কাল অপর পত্নীতে সহবাস করা— সত্যবাদী ধর্মরক্ষক যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এসব কার্যকলাপই বেমানান বলে মনে হয়েছে তার। বরং কখনও যুধিষ্ঠিরকে দুর্বল, ধর্মভীরু ও ক্লীব বলেও মনে করেছে দ্রৌপদী।

ভীমকেও দ্রৌপদী কখনও কখনও স্বামী বলে মেনে নিতে পারেনি। তাঁর বিশালাকার দেহ, অদমনীয় ক্রোধ আর খাদ্যলোলুপতা দেখে তাঁকে একাধারে দানব ও শিশু মনে করেছে দ্রৌপদী।

সুপুরুষ ও রূপবান হয়েও নকুলের পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব দ্রৌপদীর তেজস্বিতার কাছে নিশ্চিহ্ন বলেই ঠেকেছে। সহদেব স্বামী হলেও শৌর্যবান নন, বরং সহদেব তার কাছে ছোটভাই বা দেবর হিসাবেই বেশি প্রতিভাত। দ্রৌপদী ও নকুলের সম্পর্কে বাৎসল্য রসের নিরিখে বিচার করেছেন সমালোচক নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর 'মহাভারতের ছয় প্রবীণ' (আনন্দ পাবলিশার্স; মে-২০০৬) গ্রন্থে। এক কথায়, দ্রৌপদীর কাছে গান্ধিবধারী অর্জুনই পুরুষশ্রেষ্ঠ। তিনিই তাকে জয় করে এনেছিলেন। শৌর্যে, বীর্যে, প্রেমে, পৌরুষে, আবেগে, আহ্বাদে, রসিকতার, সম্ভোগে, রসবোধে পার্থই ছিলেন দ্রৌপদীর কাক্ষিকত। কিন্তু

“গল্পে দেখি অর্জুন ছাড়াও আরও একজন পুরুষের প্রতি কৃষ্ণা দুর্বল ছিলেন, অবচেতন মনে তাঁর প্রতি উদ্বেগকে অনুভব করেছেন, সেই অনুভবই কৃষ্ণের সমস্ত লজ্জা আর কুণ্ঠার কারণ।”^৭

গল্পানুযায়ী অর্জুন ব্যতীত কর্ণকে প্রার্থিত হিসাবে কামনা করেছিল দ্রৌপদী। অবচেতন মনের এই অনুভবকে গল্পকার টেনে বের করেছেন বলেই দ্রৌপদীকে করা যুধিষ্ঠিরের দোষারোপের জন্য সে লজ্জা পায়নি। বরং তার কাছে লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হল সূত্রপুত্র কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যেই নিহিত। প্রেমানুভবে তড়িত হয়েছিল বলেই জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে দ্রৌপদী স্বয়ংবর সভায় কর্ণের প্রতি করা তার স্বীয় ব্যবহারের প্রতিটি স্মৃতিকে বহন করে অনুতপ্ত হয়েছে। স্বয়ংবর সভায় তাঁকে অস্বীকার করা থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুবরণ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই দ্রৌপদীর আজ মনে হয়েছে। তার কাছে মানবিক গুণসম্পন্ন রক্ত-মাংসের যথার্থ পুরুষটি হলেন এই কর্ণ --যাঁর ব্যক্তিত্ব গরিমায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সে থাকতে পারেনি। কর্ণকে দ্রৌপদী যে কামনা করেছিল, তার আভাস আমরা কাশীরাম দাসের মহাভারতে পেয়ে থাকি। কৃষ্ণ একদা দ্রৌপদীর অন্তরের ভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে সেখানে বলেছিলেন,-

“যজ্ঞকালে কর্ণবীর আসিল যখন।

তারে দেখি মনে মনে চিন্তিত তখন ।।

এই জন হত যদি কুন্তীর নন্দন।

ইহার সহিত পতি হৈত ছয়জন !!”

তখনও কর্ণের প্রকৃত জন্ম পরিচয় তাদের কাছে অজ্ঞাতই ছিল। তবু তাঁর আচরণে স্বয়ংবর সভায় বসে দ্রৌপদী মুগ্ধ, পুলকিত ও বিস্মিত হয়ে উঠেছিল। এই আকর্ষণের কথা যুধিষ্ঠির জানতেন। কিন্তু কখনও সর্বসমক্ষে তা প্রকাশ করেননি। গজেন্দ্রকুমার মিত্র এই গ্লোকেটিকে আকর হিসাবে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের না বলা কথাকে আশ্রয় করে দ্রৌপদীর চরিত্র ও মনোগত ভাবকে নবমূল্যায়ন করলেন আলোচ্য গল্পে।

স্বয়ংসভায় দ্রৌপদী কর্ণকে সূত্রপুত্র বলে যে কঠিন বাক্যবাণে জর্জরিত করেছিল, অনুরূপ রূঢ়তার পরও সে দেখেছিল কর্ণের মধ্যে দ্রৌপদীর প্রতি তাঁর প্রেমার্ত দৃষ্টি। কোনো কামুক পুরুষ নন, একজন প্রেমবিরহ কাতর পুরুষের ছাপ লক্ষ করেছিল সেদিন দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর বিরূপ প্রত্যাখ্যানেও কর্ণের চেহারা প্রিয়কে না পাওয়ার জন্য বিন্দুমাত্র ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব দেখা যায়নি সেদিন। বরং যেন ক্ষমাসুন্দর হাসি হেসেই তিনি ত্যাগ করেছিলেন শরাসন। সেদিন কৃষ্ণ বুঝেছিল এই হাসি যিনি হাসতে পারেন, তিনি সাধারণ কেউ নন। তিনি হীনবংশের সন্তান বা সারথীপুত্র হতেই পারেন না। কিন্তু সেদিন তাঁর পরিচয় ছিল সকলের অগোচরেই। সেই থেকে কর্ণের প্রতি দ্রৌপদীর একটি প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ অনুভূত হয়েছে সর্বদা। তাছাড়া কর্ণের সুমহান আত্মত্যাগ তাকে আরও বেশি করে ভাবিয়েছে। তাঁর কবচ কুণ্ডল ত্যাগ, কুন্তীকে তাঁর পঞ্চপুত্রের মাতা থাকবে বলে আশ্বস্ত করা---সবই দ্রৌপদীকে আরও বেশি করে ভাবায় ও কর্ণের প্রতি আকর্ষিত করে। তাই যুদ্ধে কর্ণের মৃত্যু মনে নিতে পারবে না বলেই দূত-মুখে দ্রৌপদী বলে পাঠিয়েছে যে, কর্ণের অবর্তমানে তাঁর স্ত্রীর বৈধব্য সহ্য করতে পারবে না সে। কিন্তু কর্ণ দ্রৌপদীর এই গোপন অভিলাষ বুঝতে না পেরে দ্রৌপদীর স্বামী অর্জুনকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণ বধে পাণ্ডবদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইলেও সকলের অলক্ষ্যে পাণ্ডবগণী কিন্তু অব্যক্ত বেদনায় ছটফট করতে থাকে। দ্রৌপদীকে শুধুমাত্র অপেক্ষা করতে হয়েছিল কর্ণের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হওয়া পর্যন্ত। কুন্তীর মুখ থেকে কর্ণের যথার্থ পরিচয় শোনা মাত্রই তাঁর জন্য প্রকাশ্যে শোক ব্যক্ত করতে পেরে দ্রৌপদী যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। সেই মুহূর্তেই দ্রৌপদী নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। তার অব্যক্ত অনুভূতি কান্নার মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় সে মনে মনে ভেবেছে সে কী কোনো পাপ করেছে? কোনো অপরাধ? কোনো অন্যায়?— এর উত্তর সে নিজেই খুঁজে নিয়েছে আধুনিক মনস্ক রমণীর দৃঢ়তা দিয়ে। গল্পমধ্যে আমরা তার সেই গহন মনের সন্ধান পাই এভাবে,

“এ যদি পাপ হয়, এই পরপুরুষচিন্তা -পরপুরুষআসক্তি বলে স্বীকার করতে রাজি নন তিনি, শ্রদ্ধা সহানুভূতি বললেই বরং সত্য ভাষণ হয়— এই অনুভূতি যদি অপরাধ বলে গণ্য হয় তো তিনি পাপী, তিনি অপরাধিনী। এর জন্য যদি তাঁর পতন হয়ে থাকে— যদি স্বর্গ গমনে বাধা সৃষ্টি করে থাকে তাঁর মনের এ গোপন চিন্তা তো- তার জন্যেও তিনি অনুতপ্ত নন।”^{১৯}

দ্রৌপদীর কাছে ন্যায় নীতির অনুশাসন বাহ্যিক আরোপণ মাত্র। বাইরের দেহ সেই চাপিয়ে দেওয়া অনুশাসনে বাধ্য হতে পারে, কিন্তু মন সেই শাসন মানতে বাধ্য নয়। এরজন্য নরক বাস করতে হলেও সে প্রস্তুত। বোধের এই উত্তরণকে লক্ষ করে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেন যে, গজেন্দ্রকুমার মিত্র অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই তাঁর 'যাজ্ঞসেনী' গল্পে “দ্রৌপদীকে ঘিরে থাকা মিথ-কে ভেঙে দাঁড় করান আধুনিক মানবী রূপে।”^{২০}

গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর 'যাজ্ঞসেনী' গল্পের শেষ পরিণতিতে এসে দেখাচ্ছেন দ্রৌপদী এই জীবনের ভার বহন করতে নারাজ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার সখা শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষী করে প্রার্থনা জানায়, এই জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্যের যেন এখানেই অবসান ঘটে তার। সে আরও বলে, যদি জন্মান্তর হয় এবং এই পৃথিবীতে তাকে ফিরে আসতে হয় তবে এবারে আর পঞ্চ স্বামী নয়— একটি মাত্র স্বামী থাকারই প্রার্থনা করে সে। সেই স্বামী হবে অবশ্যই তার কাক্ষিত পুরুষ প্রথম কৌন্তেয় কর্ণ। এ জীবনে যত দুঃখ, আঘাত, বঞ্চনা, অবজ্ঞা, অবহেলা, অপমান সে কর্ণকে করেছে— তা সে স্নেহে, প্রেমে, সেবায়, আত্মত্যাগে ভুলিয়ে দিতে চায় পরজন্মে। পরমেশ্বরের কাছে তাই তার কাতর অনুরোধ, সে যেন দ্রৌপদীর জীবন থেকে মুক্তি পায়। যজ্ঞের আগুন থেকে যার জন্ম, সেই হোমানলের লেলিহান শিখার অসহনীয় তেজ যার জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, সেই যাজ্ঞসেনীকে ঈশ্বর যেন ক্ষমা করেন এবং দ্রৌপদীকে তার অন্তর্দহন থেকে যেন মুক্তি দেন। গল্পে এভাবেই দ্রৌপদী চরিত্রের অব্যক্ত অনুভূতির এক নবনির্মিত পাঠ রচিত হয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাই গল্পমধ্যে তার হয়ে গজেন্দ্রকুমার মিত্র মন্তব্য করেন,

“আর যদি স্বর্গবাস ভাগ্যে জোটে— শুনেছেন স্বর্গে দ্বেষ নেই, অসূয়া নেই, সকল সংস্কার, সকল বন্ধন, সকল বিধি নিষেধের উর্ধ্বে সেখানকার জীবন— সেখানে প্রকাশ্যেই তিনি পঞ্চপতির সঙ্গে অঙ্গাধিপতিরও সেবা করবেন, তাঁকে ভজনা করবেন— নিত্য অশ্রুজলে ইহলোকের অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করবেন।”^{২১}

পূর্বকৃত পাপের জন্য কর্ণের কাছে স্বর্গে গিয়েও ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়ার যে মানসিকতা দ্রৌপদীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাতে সে মহাভারতের তেজোদীপ্তা, অগ্নিসম্ভূতা আভিজাত্যের খোলস ত্যাগ করে আধুনিক যুগের একজন পরিতপ্ত রমণীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমালোচক তাই মনে করেন,

“এভাবে দ্রৌপদী চরিত্রের মধ্যে নতুনত্বের আরোপণ ঘটানোর ফলে আর গজেন্দ্রকুমার মিত্রের গল্পের ঘটনাধারা পুরাণের কাহিনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। মহাভারতের কাল অতিক্রম করে অনন্ত কালের ইঙ্গিতবাহী হয়ে মানব জীবনের চিরন্তন রহস্যকে উন্মোচন করে।”^{২২}

— এই নিরিখে বলা যায়, লেখক গজেন্দ্রকুমার মিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই এখানে মহাভারতের নবনির্মাণ করেছেন— যা যথাযথ ও আধুনিক দৃষ্টিকোণের আধারেও সুসার্থক একটি নবসৃষ্টি।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের পুরাণ কাহিনি অবলম্বনে লিখিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প হল 'জরা ও বাসুদেব'। প্রাচীন পুরাণ বলতে এখানে মহাভারতকেই বোঝানো হয়েছে— যার আধুনিক রূপদান করেছেন লেখক এই গল্পে। বিশ শতকের অভিজ্ঞতালব্ধ গজেন্দ্রকুমার মিত্র উনিশ শতকের মধুসূদনের মতোই পুরাণ- মহাকাব্য থেকে উপাদান গ্রহণ করে একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে নবতম এক শিল্পসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। তাঁর হস্তস্পর্শে পুরাণ বা প্রাচীন গাথার শক্তিদ্বারাও আধুনিক ও নতুন মাত্রা লাভ করে নবজন্ম লাভে সক্ষম হয়েছে। এমনই

একটি চরিত্র লেখকের 'জরা ও বাসুদেব' গল্পের পটভূমিকাকে তাৎপর্য মণ্ডিত করেছে। তিনি হলেন মহাভারত তথা ভাগবতের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ। সমালোচকের মতে,

“ভগবৎ চরিত্র শ্রীকৃষ্ণকে ব্যর্থ প্রেমের মনস্তাপদগ্ধ সাধারণ মানব রূপেই চিত্রিত হতে দেখা যায় গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'জরা ও বাসুদেব' গল্পে।”^{১৩}

আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কৃষ্ণচরিত' প্রবন্ধের বিজ্ঞপন অংশে বলেছেন, “.... কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার মানব চরিত্র সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি, সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে মতাবলম্বী করিবার জন্য কোনো যত্ন পাই নাই।”^{১৪} অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মানবত্বকে অনুসন্ধান করার সে প্রযত্ন লক্ষ করা গিয়েছিল ঋষি বঙ্কিমের মধ্যে, তা-ই যেন পরবর্তীকালে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'জরা ও বাসুদেব' গল্পে নবনির্মিত কলেবরে নবরূপে প্রতিফলিত হতে দেখি। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে অসফল প্রেমে জর্জরিত মনস্তাপগ্রস্ত একজন সামান্য মানুষরূপে চিত্রিত হতে দেখা যায়। যে কৃষ্ণ মহাভারতের সমস্ত ঘটনার নিয়ামকশক্তি, নিত্য আনন্দময় পুরুষ, তাঁকেও মানবদেহ ধারণ করে মর্ত্যে আগমন করার জন্য সাধারণ মানুষের মতোই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এরই সূত্র ধরে গল্পমধ্যে লেখক দেখিয়েছেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও দেহধর্মানুযায়ী জরাগ্রস্ত। দেহমনের অবসাদে তিনি ক্লান্তিময় এবং বার্ধক্যে জর্জরিত। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আত্মসমালোচনা ও অনুশোচনা নিয়ে যেভাবে তিনি গল্পমধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাতে তাঁকে সাধারণ মানুষ হিসাবেই দেখা যায়। এটা করতে গিয়ে গজেন্দ্রকুমার মিত্রকে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়েছে। গল্পমধ্যে তিনি দেখিয়েছেন ক্ষত্রিয়কুল বিনষ্ট, যাদবকুল ধ্বংসোন্মুখ, জীবনের উপান্তে এসে তাই শ্রীকৃষ্ণের পূর্বস্মৃতিকে মন্থন করে লেখক বলেছেন,

“তিনি এক সন্তানের হাতে অস্ত্র যুগিয়েছেন আর এক সন্তানের হত্যার জন্য। তাঁর চোখের সামনে তাঁর পুত্রসকল কলহে ও বিগ্রহে মেতে উঠেছে— স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে দেখেছেন তিনি, বাধা দেবার কি তাদের সংযত করার কোনো চেষ্টা করেন নি। ক্রমশ পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে নিধন করেছে, কে কাকে হত্যা করেছে তা দেখার কি জানবারও সাধ্য থাকেনি। সেই চরম সময়ে— যখন মৃত্যু নেশায় বৃন্দ হয়ে উঠেছে অন্ধক, বৃষ্টি ও ভোজ বংশীয় যাদবদের দৃষ্টি— তখন নিজেও সংহারমূর্তি ধারণ করেছেন।”^{১৫}

সাধারণ মানুষের মতো জীবনে যতো অন্যায় করেছেন তিনি তা যেন সব মিছিল করে একে একে উপস্থিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে। তাঁরই সৃষ্টি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ— যা ধ্বংসমুখী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৩৮ সালে দেখা যায় পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পরিসরে হিটলারের উত্থান, নাৎসীবাদ- ফ্যাসীবাদ আক্রান্ত সমাজ, আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নবযুগের আহ্বানে অনিবার্যভাবেই পুরানো ইতিহাসের অমোঘ পরিবর্তন সাধিত করেছিল। এই আবহ, এই সংকটেরই সুচিত্র যেন যদুবংশ ধ্বংসের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে এই গল্পে। এখানে আত্মনিধানাবশিষ্ট যাদব বংশের একটি পুরুষকেও বাঁচতে দেননি কৃষ্ণ। তাই এই বীভৎস মারণ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে একদা কৃষ্ণের মনেও সঞ্চারিত হয়েছে অবসাদ ও হতাশা। বহু লোকের আপঘাত মৃত্যুর তিনি কারণ হয়েছেন। বহু লোককে তিনি বধ করিয়েছেন। গল্পমধ্যে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাই তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। সমালোচকের মতে,

“মনের অগোচরে পাপ নেই, এতকাল এই প্রশ্নটা বা সত্যটা প্রাণপণে এড়িয়ে এলেও এখন স্বীকারে তাঁর বাধা নেই, এটাই তাঁর প্রায়শ্চিত্ত।”^{১৬}

তাই সাধারণ মানুষের মতোই গান্ধারীর অভিশাপ তাঁর জীবনে ফলেছে। ঈশ্বরের অবতার হয়েও জরাগ্রস্ত কৃষ্ণ জীবন সায়াহ্নে এসে উপলব্ধি করেছেন একের পর এক তাঁর অন্যায় কার্যগুলিকে। জরাসন্ধ বধ, দুর্যোধন বধ,

ভীষ্ম বধ, কর্ণ বধ সবই তাঁর দেখানো পথ ধরেই হয়েছে। তিনি চাইলে এত হত্যা হত না। কিন্তু তা তিনি করেননি। অর্জুনকে নিরাপদে রাখতে গিয়ে কর্ণদ্বারা ঘটোৎকোচ বধের ফলে সকলেই যখন ব্যথিত, কৃষ্ণ সেদিন খুশিই হয়েছিলেন অর্জুনের কথা ভেবে। এখানে যে মানবদেহধারী রক্ত মাংসের কৃষ্ণের পরিচয় প্রতিভাত হয়, তাকেই গজেন্দ্রকুমার কাজে লাগিয়েছেন। আবার কর্ণকে হত্যা করার সময়ও একটি ঈর্ষা কাজ করেছে মানবদেহধারী কৃষ্ণের মধ্যে। এই ঈর্ষার মূল কারণ দ্রৌপদী। দ্রৌপদী যে কর্ণকে কামনা করতেন তা কৃষ্ণের অজানা ছিল না। অথচ কৃষ্ণ নিজেই দ্রৌপদীর প্রতি দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন। এজাতীয় মানবতাসুলভ আচরণ যতোই পরিণতিতে এসে কৃষ্ণকে ক্ষতবিক্ষত করুক না কেন, এই দুর্বল স্থানগুলিকে উসকে দিয়েই লেখক তাঁর গল্পে এনেছেন নবনির্মাণের আশ্বাদ। সমালোচকের ভাষায়,

“মানবদেহধারী কৃষ্ণের মধ্যে আসলে লেখক মহাভারতের কহিনীকে নিজের মতো করে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর তাতে সঞ্চর করেছেন আধুনিক মানুষের মনুষ্যত্ব ও দ্বন্দ্ব বেদনা। যার বহিঃপ্রকাশ স্বয়ং কৃষ্ণ।”^{১৭}

আধুনিক মানুষের জীবন যন্ত্রণার প্রতীক হয়ে উঠেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকেও যাজ্ঞসেনীর প্রতি দুর্বল হতে দেখা যায়। তাই কর্ণকে হত্যা একদিন যে তৃপ্তি তিনি পেয়েছিলেন আজ মানবসুলভ পরিতাপে তিনি মনে করছেন, কর্ণ বেঁচে থাকলে তিনি তাঁর হাত ধরে অশ্রুজলে এই কলুষ ধুয়ে দিতেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করতেন। তাই জরারূপী বাসুদেবকে কৃষ্ণ বলেন,

“সকল মহাপুরুষেরই— যাদের দেহ ধারণ করলেও লোকান্তর হবার সাধ যায় না, অহংকার যায় না, ঐশীশক্তির— তাদের নির্বুদ্ধিতার স্মরণ করাবার জন্য যুগে যুগে তোমার মতো বন্ধুর প্রয়োজন হবে। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।”^{১৮}

এই বন্ধুই হল মানবদেহের জরাগ্রস্ততা— যে জরার আশ্রয় গ্রহণ করে প্রায়শ্চিত্ত অভিমুখে যাত্রার কথা ভাবতে পেরেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। আর এই মৃত্যু পথের পথিক জরাগ্রস্ত কৃষ্ণের মহাভারতীয় অংশকে পাথেয় করে নিয়েই তাতে লেখকের নিজস্ব কল্পনার আবেশ মিশিয়ে গল্পমধ্যে সৃষ্টি করলেন অভিনব একটি স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জনাকে অভিনবত্ব দান করতে গিয়ে গল্পের একেবারে অন্তিমে বাসুদেবের হাহাকারকে অনবদ্য ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন লেখক, দেহাবসানের পূর্বে

“আর একবার চারিদিকে চাইলেন বাসুদেব। জন্মেছিলেন অন্ধ কারাগারে— কিন্তু তারপর জ্ঞান হতে যে শ্যামাসুন্দরী ধরিত্রীকে দেখেছিলেন, ... মৃত্যুকালে দেখে গেলেন তাকে কামনা কলুষ..... এক মহাশ্মশান। সেখানে সত্য নেই, সেখানে ক্ষমা নেই.... কিছুই নেই আর। আছে শুধু দুর্বীর লোভ আর লালসা.... আছে সর্বনাশা আত্মঘাতী বুদ্ধি।”^{১৯}

— এভাবেই পরিণত বয়সের লেখায় লেখক চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হেনেছেন। কৃষ্ণের এই স্বগতোক্তি যথেষ্ট করুণ ও হৃদয়বিদারক। এই উক্তির মধ্যে ধরা পরে না হেমলেটের দ্বিধা দ্বন্দ্ব (To be or not to be), এখানে বাসুদেবের মতে এক মহাশ্মশানরূপ পৃথিবীকে পেছনে ফেলে রেখেই তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে। এই আক্ষেপ মানবিক গুণসমৃদ্ধ। এখানে তিনি ঈশ্বর হলেও তাঁকে লেখক ট্রাজিক নায়ক করেই তুলেছেন। গল্পের শেষ অংশে তাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে লেখক যা বলিয়েছেন তার হাহাকার আজও পাঠকসমাজকে ভাবিত করে। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হলেও (কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং) তাঁকেই আবার জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে মৃত্যুকালীন সময়ে আরও এক সর্বশক্তিমানের উদ্দেশে প্রার্থনা করতে দেখা যায়,

“ক্ষমা করো, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বরের ঈশ্বর, ক্ষমা করো তুমি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে, ক্ষমা করো!”^{২০}

মিথ পুরাণের এই বিনির্মাণ ঘটিয়ে যে অনবদ্যতার পরিচয় লেখক দিয়েছেন তা যেমন আধুনিক তেমনই আজও সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

যেমন উপন্যাস, তেমনই ছোটগল্পে মহাভারতের কাহিনিকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে উপাদান হিসাবে নিয়ে তারমধ্যে মানব জীবনের প্রলেপ ঘটিয়ে গজেন্দ্রকুমার মিত্র বাংলা সাহিত্যে নবনির্মাণ ও বিনির্মাণের এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর সাহিত্য সম্ভারের পাতা থেকে মাত্র ছোট দুটি গল্পকে নির্বাচন করে নিয়ে তারই আধারে দেখানোর প্রয়াস করা হল যে, এজাতীয় সাহিত্য প্রকরণে লেখকের সিদ্ধি যথেষ্টই প্রশংসনীয় এবং তা অবশ্যই আলোচনাযোগ্য একটি বিষয়।

তথ্যসূত্র:

- ১) দাশ, শিশিরকুমার। কাব্যতত্ত্ব: অ্যারিস্টটল। আশা প্রকাশনী, কলকাতা, ১ম প্রকাশ-মে ১৯৫৭; পৃ. ১২।
- ২) মল্লিক, দেবারতি (সম্পা)। 'সন্ধান' পত্রিকা। ১২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০২৪ জানুয়ারি, প্রকাশক-গৌরী পাবলিশিং হাউস, ৪৪/১ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৭০০০০৯, (সনৎকুমার নস্করের মুখবন্ধ অংশ থেকে গৃহীত), পৃ. ৪।
- ৩) ভট্টাচার্য, তপোধীর। "জাক দেরিদা: তাঁর বিনির্মাণ"। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ম দে'জ সংস্করণ-সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ৪৬।
- ৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড। দ্রষ্টব্য, রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার বিভাগ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭১২।
- ৫) সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী। মিথ পুরাণের ভাঙা গড়া। পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১৫; কোলকাতা-৯, পৃ. ২৩।
- ৬) খাটুয়া, সুখেন্দু। "ইতিহাস চেতনার আলোকে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কথাসাহিত্য"। বার্ষিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বার্ষিক সাহিত্য উৎসব ২০১৯; পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪২৩; পৃ. ৮৩।
- ৭) খায়ের, নাজমিন। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'যাজ্ঞসেনী' গল্পে দ্রৌপদী: অব্যক্ত অনুভূতির নবনির্মিত পাঠ' প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। উৎস- খোকন কুমার বাগ (সম্পা) - 'অন্তর্মুখ' বাংলা গবেষণা পত্রিকা, পর্ব ৯, সংখ্যা ৪, ত্রৈমাসিক, এপ্রিল-জুন ২০২০, বাদশাহী রোড ভাঙ্গাকুঠি, পূঃবর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০১, পৃ. ১৬।
- ৮) মজুমদার, সুবোধচন্দ্র (সম্পা)। কাশীদাসী মহাভারত। দেব-সাহিত্য- কুটির, নভেম্বর ১৯৮১, বামা পুকুর লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ৫৩৮।
- ৯) মিত্র, গজেন্দ্রকুমার। গজেন্দ্রকুমার মিত্র শতবার্ষিকী সংকলন। যাজ্ঞসেনী গল্প; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩; পৃ. ৭৫৩।
- ১০) মাঝি, প্রসূন। 'গজেন্দ্রকুমার মিত্রের গল্পে মিথ পুরাণের বিনির্মাণ' প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। উৎস- সবিতেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা)- কথাসাহিত্য পত্রিকা; শারদীয় ১৪২৮, ৭৩ বর্ষ, কার্তিক, ১ম সংখ্যা, ২০-এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯; পৃ. ১২৭।
- ১১) মিত্র, গজেন্দ্রকুমার। গজেন্দ্রকুমার মিত্র শতবার্ষিকী সংকলন, যাজ্ঞসেনী গল্প, তদেব, পৃ. ৭৫৪।
- ১২) খাটুয়া, সুখেন্দু। "ইতিহাস চেতনার আলোকে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কথাসাহিত্য"। তদেব, পৃ. ৮৭।
- ১৩) মাঝি, প্রসূন। "গজেন্দ্রকুমার মিত্রের গল্পে মিথ পুরাণের বিনির্মাণ"। তদেব, পৃ. ১২৭।
- ১৪) চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম রচনাবলী। প্রবন্ধ অংশ, 'কৃষ্ণচরিত' প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন অংশ, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর - ২০০৯, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ নেই।

- ১৫) মিত্র, গজেন্দ্রকুমার। কথা কল্পনা কাহিনী (দ্বিতীয় স্তবক), 'জরা ও বাসুদেব' গল্প। মিত্র ও ঘোষ প্রাণলিঃ, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ -আষাঢ়-১৩৯৪, পৃ. ৪২।
- ১৬) দাস, ড. সচ্চিদানন্দ। "বাংলা সাহিত্যে পুরাণ ও পৌরাণিক কথাসাহিত্য"। প্রথম প্রকাশ- কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি-২০১৫, মাঘ ১৪২১, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০০ ৯, পৃ. ৩২৬।
- ১৭) খাটুয়া, সুখেন্দু। 'ইতিহাস চেতনার আলোকে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কথাসাহিত্য'। তদেব, পৃ. ৮৫।
- ১৮) মিত্র, গজেন্দ্রকুমার। কথা কল্পনা কাহিনী (দ্বিতীয় স্তবক)- তদেব, পৃ. ৪৯।
- ১৯) তদেব, পৃ. ৫০।
- ২০) তদেব, পৃ. ৫০।

গ্রন্থপঞ্জি:

- ১) দাশ, শিশিরকুমার। কাব্যতত্ত্ব: অ্যারিস্টটল। আশা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ-মে ১৯৫৭, কলকাতা-৯।
- ২) মল্লিক, দেবারতি (সম্পা)। 'সন্ধান' পত্রিকা। ১২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০২৪ জানুয়ারি, প্রকাশক-গৌরী পাবলিশিং হাউস, ৪৪/১ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৭০০০০৯।
- ৩) ভট্টাচার্য, তপোধীর। 'জাক দেরিদা: তাঁর বিনির্মাণ'। দেজ পাবলিশিং, ১ম দে'জ সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ২০১৩, কলকাতা ৭৩।
- ৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড। দ্রষ্টব্য, রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার বিভাগ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা ১৬।
- ৫) সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী। মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া। পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১৫; কলকাতা- ৯।
- ৬) খাটুয়া, সুখেন্দু। ইতিহাস চেতনার আলোকে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কথাসাহিত্য। বার্ষিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বার্ষিক সাহিত্য উৎসব ২০১৯; পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪২৩
- ৭) বাগ, খোকনকুমার (সম্পা)। 'অন্তর্মুখ' বাংলা গবেষণা পত্রিকা, পর্ব ৯, সংখ্যা ৪, ত্রৈমাসিক, এপ্রিল-জুন ২০২০, বাদশাহী রোড ভাঙ্গাকুঠি, পূঃবর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০১,
- ৮) মজুমদার, সুবোধচন্দ্র (সম্পা)। কাশীদাসী মহাভারত; দেব-সাহিত্য- কুটির, নভেম্বর ১৯৮১, বামা পুকুর লেন, কলকাতা-৯।
- ৯) মিত্র, গজেন্দ্রকুমার। গজেন্দ্রকুমার মিত্র শতবার্ষিকী সংকলন; যাজ্ঞসেনী গল্প; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩।
- ১০) রায়, সবিতেন্দ্রনাথ (সম্পা)। কথাসাহিত্য পত্রিকা; শারদীয় ১৪২৮, ৭৩ বর্ষ, কার্তিক, ১ম সংখ্যা, ২০-এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭৩।
- ১১) চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম রচনাবলী, প্রবন্ধ অংশ, 'কৃষ্ণচরিত' প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন অংশ, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর - ২০০৯, কলকাতা-৭০০০৭৩।
- ১২) মিত্র, গজেন্দ্রকুমার। কথা কল্পনা কাহিনী (দ্বিতীয় স্তবক)। 'জরা ও বাসুদেব' গল্প। মিত্র ও ঘোষ প্রাণলিঃ, দ্বিতীয় মুদ্রণ -আষাঢ়-১৩৯৪, কলকাতা-৭৩।
- ১৩) দাস, ড. সচ্চিদানন্দ। "বাংলা সাহিত্যে পুরাণ ও পৌরাণিক কথাসাহিত্য"। প্রথম প্রকাশ- কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি-২০১৫, মাঘ ১৪২১, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯।